উৎস

কাজী নজরুল ইসলামের লেখা প্রথম দুটি কবিতা 'বিদ্রোহী' ও 'প্রলয়োল্লাস' প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালের প্রথম দিকে। তাঁর 'প্রলয়োল্লাস' কবিতাটি ১৯২২ সালেই প্রকাশিত 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

ভাববস্তু

কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'প্রলয়োল্লাস' কবিতাটি আসলে, ইংরেজ শাসকের প্রতি মুক্তিকামী এক মানুষের অন্তরের সতর্কবার্তা। বৈপ্লবিক আবেগ জোট বাঁধছে এবং তা তীব্রবেগে এগিয়ে আসছে সিন্ধুপারের সিংহদ্বারে আঘাত হানতে। ভারতমাতাকে পরাধীনতার অর্গল থেকে মুক্তিদান করাই তার উদ্দেশ্য। চারদিকে ভয়ংকরের ইঙ্গিতবাহী ঝড়-তুফান এবং বজ্রের সঘোষ-হর্ষ। মহাকালের হাতের চাবুক যেন বিদ্যুতের মতো চমকিত হচ্ছে, বজ্রপাতের শব্দ যেন তার হ্রেষাধ্বনি। সেই ঘোড়ার খুরের আঘাতে উল্কা খসে পড়ছে নীল আকাশের বুক থেকে। যেন মহাকালের আগমনবার্তা ধ্বনিত হচ্ছে তার রথের চাকার প্রবল ঘর্ষণে। এই প্রলয় ভয়ংকর, এই প্রলয় ধ্বংসকারী। সে কালবৈশাখী ঝড়ের মতো সকল জীর্ণতাকে বিনাশ করে নতুনের আগমন ঘোষণা করে। কবি জয়ধ্বনির মধ্য দিয়ে তাকে অন্তরের সম্ভাষণ জানান। এই কাল-ভয়ংকর যেন প্রলয়ের নেশায় ও তাণ্ডবে মত্ত। সাত সমুদ্রপারের সিংহদরজা সে কেবল বজ্রনির্ঘোষে ভেঙে ফেলে। অন্ধকার মৃত্যুকূপ থেকে মহাকালকে সঙ্গী করে, বজ্র প্রজ্বলিত মশাল হাতে ছুটে আসে সেই ভয়ংকর। তার হাসিতে বিভীষিকা। তার ঘোর কৃষ্ণবর্ণের কেশরাশির ঝাপটায় আকাশ দোলে, বহ্নিমান ধূমকেতু যেন তার

দাসত্ব করে। জরাগ্রস্ত সংস্কার, পরাধীন মনের আবদ্ধতা ও নিষ্প্রাণ-বর্ণহীন অসুন্দরকে, জীবন থেকে বিনাশ করতে নবদিগন্তের সূচনাকারী প্রলয়ের বন্দনাগান গেয়েছেন কবি। আর এই প্রলয় প্লাবিত হৃদয়ের আশা-ভীতি ও রোমাঞ্চের দোলাচলকেই কবি 'প্রলয়োল্লাস' কবিতায় ব্যক্ত করেছেন।

নামকরণের সার্থকতা

সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে নামকরণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ নামকরণের মাধ্যমে কবি বা লেখক রচনা সম্পর্কে পাঠককে যেমন ইঙ্গিতপূর্ণ আভাস দেন, তেমনই সুকৌশলে নিজের সৃজন-অভিপ্রায়টিও ব্যক্ত করেন। তাই নামকরণের মধ্য দিয়ে স্রষ্টার জীবনদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে, সৃষ্টির অন্তরে নিহিত ব্যঞ্জনাটিও পরিস্ফুট হয়। আমাদের আলোচ্য কবিতাটির নাম 'প্রলয়োল্লাস'। সচেতন পাঠক কবিতাটি পাঠ করলেই বুঝতে পারবেন যে, কবিতার মূলভাবের প্রতি দৃষ্টি রেখেই কবি কাজী নজরুল ইসলাম এই নামকরণ করেছেন। 'প্রলয়োল্লাস' একটি সন্ধিবদ্ধ শব্দ, যাকে বিভক্ত করলে পাই—প্রলয় এবং উল্লাস। 'প্রলয়' শব্দের অর্থ হল বিনাশ বা ধ্বংস, অন্যদিকে 'উল্লাস' শব্দের অর্থ আনন্দ বা উচ্ছ্বাস। কিংবা কেবল আনন্দ নয়, আনন্দের উচ্চকিত উদ্‌যাপন। আপাতদৃষ্টিতে শব্দ দুটি পরস্পরবিরোধী হলেও সূক্ষ্মবিচারে ধ্বংসের মধ্যে, ভয়াবহ বিনাশের আড়ালে, নতুনের শুভ জন্মক্ষণ সূচিত হওয়ার যে প্রাণময় বার্তা ঘোষিত হয়, প্রলয়রূপী সেই নবীনতার বিজয়মন্ত্রই উচ্চারণ করেছেন কবি নজরুল। তাই কবিতার নাম 'প্রলয়োল্লাস'। এ কবিতায় বারে বারে আমরা 'প্রলয়-নেশার নৃত্য পাগল', 'অট্টরোলের হট্টগোলে স্তব্ধ চরাচর', 'জরায়-মরা মুমূর্ষুদের প্রাণ-লুকানো ওই বিনাশে', 'দিগম্বরের জটায় হাসে শিশু-চাঁদের কর', 'প্রলয় নূতন সৃজন-বেদন', 'কাল-ভয়ংকরের বেশে', 'এবার ওই আসে সুন্দর' ইত্যাদি পরস্পরবিরোধী চিত্রকল্পকে চক্রাকারে আবর্তিত হতে দেখি। সেই প্রলয় তাই কখনও 'কালবোশেখির ঝড়', কখনও 'মহাকালের চণ্ড রূপ', কখনও 'দ্বাদশ রবির বহ্নিজ্বালা-র রূপ ধারণ করেও শেষে সেই 'চিরসুন্দর' হয়ে ওঠে। আসলে কবি দাসত্বে আবদ্ধ, পরানুকরণপ্রিয়, শোষণ ও নিপীড়নে অভ্যস্ত এই হতশ্রী আপসকামী বর্তমানকে ধ্বংস করতে চান। কারণ ধ্বংস ছাড়া এই ঘুণ-ধরা বর্তমান থেকে জাতীয় জীবনের উত্তরণ সম্ভব নয়। এজন্য কবি সচেতনভাবেই সমগ্র কবিতার মধ্যে এক ধরনের উদ্দামতা ও উন্মত্ততা সৃষ্টি করেন। পরাধীনতার সূর্যের অস্তমানতা, বিদেশি ঔপনিবেশিক নিষ্ঠুর শাসনের ভাবী অবসানকে ত্বরান্বিত করতে, কবি নজরুল উল্লাসের অট্টহাস্যে যেন সেই ধ্বংসকেই উদ্‌যাপন করেছেন। কাজেই এ কবিতার

নাম 'প্রলয়োল্লাস' ভিন্ন, আর কিছুই হওয়া সম্ভব ছিল না। যে কবি 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' অট্টহাস্যে ফেটে পড়তে পারেন, 'প্রলয়োল্লাস'-ও তো তাঁকেই মানায়।